আবদ্ধ আবস্থায় মায়া হরিণ পালন ও ব্যবস্থাপনা

বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট

আঞ্চলিক কেন্দ্র, নাইক্ষ্যংছড়ি, বান্দরবান।

মুখবন্ধ

"আবদ্ধ আবস্থায় মায়া হরিণ পালন ও ব্যবস্থাপনা " শীর্ষক বুকলেটটি প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি খুশি হয়েছি। হরিণ পালনের ইতিহাস অনেক পূরনো হলেও বাংলাদেশে এটির গত কয়েক বছরে কিছুটা প্রসার ঘটেছে। প্রকৃতির এক সুন্দরতম বন্য প্রাণীর নাম হরিণ। এর রঙ-চঙা শরীর আবাল-বৃদ্ধ বনিতা সকলের নিকট আকর্ষণীয়। অতি কম সংখ্যায় হলেও, কিছু কিছু সৌখিন ব্যক্তি বাড়ির আঙ্গিঁনায় হরিণ পালন করে থাকেন। আগে এদেশে বেশ কয়েক প্রজাতির হরিণ ছিল। তম্মধ্যে চিত্রা, সাম্বার, পারা, বারশিংগা ও মায়া হরিণ উল্লেখযোগ্য। অথচ বর্তমানে কেবল চিত্রা ও মায়া হরিণই চোখে পড়ে তাও কেবল সুন্দরবন অথবা চিড়িয়াখানা গুলোতে। যেহেতু চিড়িয়াখানা গুলোতে এই ধরণের হরিণ অত্যন্ত সহজে পোষা সম্ভব হচ্ছে সেহেতু বসতভিটায়ও হরিণ পোষা সম্ভব হবে। হরিণ পালন বেশ লাভজনক। গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া এবং হাঁস-মুরগির মাংসের তুলনায় হরিণের মাংস অবশ্য অনেক বেশি ব্যয়বহুল। হরিণ পালন আমাদের সমাজে আভিজাত্যের প্রতীক হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে তবে এটি আগন্তুক বা জনসাধারণের বিনোদনেরও খোরাক। কৃষিভিত্তিক এ দেশের মানুষ বহুকাল ধরেই গরু, মহিষ, ভেড়া, ছাগল পালন করে আসছে। তাদের এ বাস্তব অভিজ্ঞতা ও চিন্তা-ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে তৃনভোজী আলোচ্য এই আকর্ষণীয় প্রাণীটিকে লালন পালন ও পরিচর্যার একটি সহজসাধ্য ব্যাপার। আমাদের দেশের আবহাওয়া হরিণ পালনের জন্য যথেষ্ট অনুকূল। এমতাবস্থায়, হরিণ পালনকে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির উন্নয়নের কাঠামোতে অন্তর্ভূক্ত করা যায় কিনা সেটা সম্ভবতঃ ভাববার সময় এসেছে। সরকার ও বেসরকারি বিভিন্ন সংস্থা এ বিষয়ে যথাযথ গুরুত্ব আরোপ করলে হয়তো একটা দিক নির্দেশনা পাওয়া যেতে পারে। পোল্ট্রি ও প্রাণিসম্পদের গবেষণার জন্য একমাত্র জাতীয় প্রতিষ্ঠান "বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএলআরআই)" প্রাণি বা পোল্ট্রির যে কোন ধরণের গবেষণার জন্য অগ্রণী ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। দেশীয় পদ্ধতিতে হরিণ পালনের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সৃস্টি, প্রাণীজ আমিষের চাহিদা পূরণ এবং গ্রামের বেকার ও নারীগোষ্ঠীকে সম্পৃক্ত করে সুস্থ সবল জাতি গঠিত হবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

ড. নাথু রাম সরকার
মহাপরিচালক

রচনায়ঃ

প্রধান গবেষক ঃ

মোঃ আশাদুল আলম, ঊর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, সিস্টেম রিসার্চ ডিভিশন।

সহযোগী গবেষক ঃ

ড. নাথু রাম সরকার, মহাপরিচালক, বিএলআরআই, সাভার, ঢাকা।

ড. মোঃ আজহারুল ইসলাম তালুকদার, মূখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, বিএলআরআই, সাভার, ঢাকা।

ড. মোঃ এরসাদুজ্জামান, বিভাগীয় প্রধান, সিস্টেম রিসার্চ ডিভিশন।

ড. রেজিয়া খাতুন, ঊর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, সিস্টেম রিসার্চ ডিভিশন।

মোঃ মোখলেছুর রহমান, বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, সিস্টেম রিসার্চ ডিভিশন।

ডাঃ মোঃ আনোয়ার হোসেন, বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, সিস্টেম রিসার্চ ডিভিশন।

মোঃ ইউসুফ আলী, বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, সিস্টেম রিসার্চ ডিভিশন।

সম্পাদনাঃ

ড. নাথু রাম সরকার, মহাপরিচালক, বিএলআরআই, সাভার, ঢাকা।

ড. রেজিয়া খাতুন, ঊর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, সিস্টেম রিসার্চ ডিভিশন।

বিএলআরআই প্রকাশনা নং-৩০৩

প্রকাশকালঃ মার্চ, ২০১৯ খ্রিঃ

প্রথম সংস্করণঃ ১০০০ (এক হাজার) কপি।

প্রকাশনায়ঃ

বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট

আঞ্চলিক কেন্দ্র, নাইক্ষ্যংছড়ি, বান্দরবান।

ফোনঃ ০৩৬১-৪১০০৭, ০১৭১০৪৮০৫৪১

ই-মেইলঃ apple_bau118@yahoo.com

বিএলআরআই কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত।

ভূমিকা

হরিণ Artiodactyla বর্গের Cervidae গোত্রের রোমন্তক স্তন্যপায়ী প্রাণী, এই গোত্রের সব সদস্যই স্বভাব ও গড়নের দিক থেকে প্রায় অভিন্ন। স্ত্রী হরিণের মাথায় কোন শিং থাকে না। পুরুষ হরিণের মাথায় থাকে শাখা বিশিষ্ট একজোড়া শিং। এগুলি প্রথমে কোমল ভেলভেট-এর মতো রোমশ চামড়া দিয়ে ঢাকা থাকে এবং পরে পরিণত বয়সে শুকিয়ে যায় এবং এক সময় খসে পড়ে। বাংলাদেশের প্রকৃতিক বনাঞ্চলে বেশ কয়েক প্রজাতির হরিণ দেখতে পাওয়া যেত। তার মধ্যে চিত্রা হরিণ (Spotted deer), সাম্বার হরিণ (Samber deer), নাত্রিণি হরিণ (Hog deer), বারশিংগা হরিণ (Swamp deer) এবং মায়া হরিণ (Barking deer) উল্লেখযোগ্য। সবচেয়ে সুন্দর আর পরিচিত প্রজাতির হরিণ হলো চিত্রা হরিণ। এরা হলুদ, হালকা বা গাঢ় বাদামি পিঠ জুড়ে থাকে সাদা রঙের গোল গোল ফোঁটা। এদের আবাসস্থল প্রধানত সুন্দরবন এবং নিঝুম দ্বীপ। হরিণ প্রজাতির মধ্যে সবচেয়ে বৃহত্তম হরিণ হল সাম্বার হরিণ এবং এরা চট্টগ্রাম, পার্বত্য-চট্টগ্রাম ও সিলেটের বনে বাস করে। এ প্রজাতির হরিণের মুখমন্ডল অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ আর সরু। এক সময়ে সিলেটের বনাঞ্চলে নাত্রিণি হরিণ দেখা গেলেও বাংলাদেশে এটি আর টিকে নেই। মাঝারী আকারের সুঠামদেহীর হরিণ হল বারশিংগা হরিণ, যার বহুশাখা বিশিষ্ট শিঙের কারণে এরুপ নামকরণ করা হয়েছে। বারশিংগা হরিণটি এক সময়ে বাংলাদেশের গহীন জঙ্গলে দেখা গেলেও এখন আর দেখা যায় না। মায়া হরিণ বাংলাদেশে প্রাপ্ত হরিণ গুলোর মধ্যে সবচেয়ে ছোট আকারের লালচে বাদামী পিঙ্গল রঙের ফোটাঁ বিহীন হরিণ, যার বৈজ্ঞানিক নাম হল 'Muntiacus vaginalis'। এই 'Muntiacus' বর্গের মায়া হরিণের স্বীকৃত প্রায় ১২ টি প্রজাতি এবং ১৫ টি উপ-প্রজাতি বিদ্যমান। এই ১২ টি 'Muntiacus' বর্গের অর্ন্তগত হরিণ প্রজাতির মধ্যে সবচেয়ে পরিচিত এবং ছোট হরিণ হল মায়া হরিণ বা কমন মাউন্টজ্যাক, যার বৈজ্ঞানিক নাম 'Muntiacus muntjac'. বাংলাদেশে সচারাচর যে মায়া হরিণটি দেখা যায়, সেটি হলো Indian muntjac বা Northern red muntjac বা Indian red muntjac যার অন্য নাম Barking deer বা কাঁকর হরিণ। মায়া হরিণ ভয় পেলে বা শিকারী প্রাণী দেখলে বা নতুন কোন আগন্তক দেখলে কুকুরের মতো ঘেউ ঘেউ করে বলে একে Barking deer বলে। ধারণা করা হয়, এই মায়া হরিণ (Muntjac) পরিচিত হরিণগুলোর মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীনতম হরিণ, যা ১৫-৩৫ মিলিয়ন বছর পর্বে মায়োসিন (miocene) যুগে ফ্রান্স, জার্মানি এবং পোল্যান্ডে দেখতে পাওয়া যায়। জীবাশ্ম বিজ্ঞানীদের মতে, বার হাজার বছর পূর্বে প্লেইস্টোসিন যুগের শেষের দিকে মায়া হরিণের অস্তিত্ব ছিল। তখন থেকেই মাংশ ও চামড়ার জন্য পুরো দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া জুড়ে এরা শিকার হয়ে আসছে।

মায়া হরিণের বৈশ্বিক আবাসস্থল

মায়া হরিণ (Barking deer) প্রজাতিটি দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার একটি সম্পদ, যা উত্তর-পূর্ব ইন্ডিয়া, পাকিস্তানের ইসলামাবাদ, শ্রীলঙ্কা, মায়ানমার, ইন্দোনেশিয়ার দীপপুঞ্জ, তাইওয়ান, চিনের দক্ষিণাঞ্চল এবং বাংলাদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত। জাপানের কিছু এলাকাসহ নেপাল ও ভূটানের 'Terai' অঞ্চলেও এদের দেখতে পাওয়া যায়। Barking deer এর একটি বড় অংশ ইংল্যান্ডে অবস্থিত। এই বন্য মায়া হরিণগুলো খুবই দ্রুত বৃদ্ধি লাভ করে। যুক্তরাজ্যের 'British Deer Society' ২০০৫ সাল হতে ২০০৭ সাল পর্যন্ত বন্য হরিণের উপর একটি গবেষণা জড়িপ পরিচালনা করে দেখতে পান, মায়া হরিণ বা Muntjac গুলো দৃশ্যমানভাবে নিজেরা এবং তাদের নিজস্ব এলাকা (rage) বৃদ্ধি করে চলে।

বাংলাদেশে মায়া হরিণের আবাসভূমি

মায়া হরিণের যার মূল আবাস ভূমি হল দক্ষিন ও দক্ষিন-পূর্ব এশিয়া।'The IUCN Red List of threatened Species-2016' অনুসারে হরিণের এই প্রজাতিটি সবচেয়ে বিস্তৃত বন্য খুরওয়ালী প্রানী যা বন্য শুকরের চেয়েও ব্যাপকভাবে বিস্তৃতি লাভ করে। বাংলাদেশের সমতল ভূমির বন,পাহাড়ী বন এবং লোনা পানির বাদা বনে মূলত মায়া হরিণ বসবাস করে থাকে। এদেশের সর্বাপেক্ষা বৃহৎ বন সুন্দরবন সহ অন্যান্য সংরক্ষিত বনাঞ্চল গুলোতে মায়া হরিণ দেখতে পাওয়া যায়। সংরক্ষিত বন ও পাখিদের অভয়াশ্রম হিসেবে পরিচিত হবিগঞ্জ জেলার চুনারুঘাট উপজেলার রঘুনন্দন পাহাড়ে অবস্থিত 'সাতছড়ি জাতীয় উদ্যান', একই জায়গায় বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় প্রাকৃতিক বনভূমি এবং দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য 'রেমা-কালেঙ্গা অভয়ারণ্য', চির-হরিত বনের একমাত্র উদ্যান হিসেবে পরিচিত মৌলভীবাজার জেলার কমলগঞ্জ উপজেলায় অবস্থিত 'লাউয়াছড়া জাতীয় উদ্যান', কক্সবাজার জেলার 'ডুলাহাজরা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সাফারি পার্ক', একই জেলার 'হিমছড়ি জাতীয় উদ্যান', গাজীপুরের 'বঙ্গবন্ধু সাফারি পার্ক', টাঙ্গাইল জেলার মধুপুর উপজেলায় অবস্থিত 'মধুপুর জাতীয় উদ্যান' সহ আরো কিছু জাতীয় উদ্যান ও অভয়ারণ্যে মায়া হরিণ লালন-পালন করা হয়। বাংলাদেশের কিছু চিড়িয়াখানা যেমন চট্টগ্রাম চিড়িয়াখানা এবং রাজশাহী চিড়িয়াখানায় দুই থেকে চারটি করে মায়া হরিণ দেখতে পাওয়া যায়। এছাড়াও শিক্ষা ও গবেষণার মাধ্যমে প্রাকৃতিকভাবে ও গবেষণা খামারে সংরক্ষণ করার নিমিত্তে বন্য বিলুপ্ত প্রায় এই মায়াবী প্রানীটিকে সংরক্ষণ করতে দেখা যায় চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং বান্দরবান জেলার নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলায় অবস্থিত 'বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট'-এর আঞ্চলিক কেন্দ্রের গবেষণা খামারে।

মায়া হরিণের স্বভাব প্রকৃতি

- মায়া হরিণ বা কাঁকর হরিণের স্বভাব বৈশিষ্ট্য চমৎকার এবং বৈচিত্র্যময়। এরা অত্যন্ত আদর প্রিয়, লাজুক এবং সহজেই পোষ মানে। এদের চোখের চাহুনি মায়াবি বলেই হয়তো এর নামকরণ করা হয়েছে মায়া হরিণ।
- এরা ভয় পেলে কিচ কিচ শব্দ করে এবং রাগ হলে সামনের পা দিয়ে মাটিতে প্রচন্ড ভাবে আঘাত করতে থাকে।
- প্রজনন কাল (Rut time) এবং জন্মের প্রথম ছয় মাস ছাড়া একটি পরিণত মায়া হরিণ নির্জন, নিরিবিলি পরিবেশ পছন্দ করে। একটি পুরুষ মায়া হরিণ তার খাবার হিসেবে ঘাস বা পোকামাকড়ের ব্যাপারে খুবই সতর্ক।
- মায়া হরিণের চোখের এক ইঞ্চি নিচে একটি 'প্রিঅরবিটাল' গ্রন্থি' থাকে, যার নিঃসরণ দিয়ে তার নিজস্ব এলাকা বা সীমানা দখল চিহ্নিত করে। পুরুষ মায়া হরিণ তার এই গ্রন্থি' হতে নিঃসৃত তরলের ঘ্রাণ মাটিতে ঘঁষে অথবা গাছের গায়ে লাগিয়ে অথবা পায়ের ক্ষুর দিয়ে ঘঁষে ঘঁষে অথবা তার লম্বা দাঁত দিয়ে গাছের ডাল ঘঁষে ঘঁষে তার নিজস্ব এলাকা সীমানা চিহ্নিত করে রাখে। 'প্রিঅরবিটাল' গ্রন্থি'র এই ঘ্রান অন্য মায়াদের এই সংকেত দেয় যে এ এলাকা দখলকৃত।
- পুরুষ মায়া হরিণ প্রায়শই নিজের দখলকৃত এলাকা, খাবার অথবা কখনও কখনও নিজের পছন্দের স্ত্রী মায়ার জন্য একে অন্যের সঙ্গে মারামারিতে জড়িয়ে পরে। আর এক্ষেত্রে তারা তাদের শিং বা ছেদন দাঁত ব্যবহার করে থাকে।
- মায়া হরিণের বিচরণ ক্ষেত্রে পুরুষ হরিণের আধিপত্য একচেটিয়া। একটি পুরুষ মায়া হরিণ তার নিজেস্ব এলাকার মালিক এবং সেখানে বসবাস করা সব হরিণী তার অধিকারে থাকে। অন্য এলাকার কোন হরিণ তার চিহ্নিত এলাকায় প্রবেশ করতে দিতে একদমই অনিচ্ছুক, তবে যদি কোন পুরুষ হরিণ তার বনাঞ্চলের এলাকা দখল করতে পর্যাপ্ত ক্ষমতা ব্যবহার করতে না পারে বা সার্মথ্য না হয় তবে সে অন্য কোন শিকারী প্রাণী দ্বারা শিকার হয়।
- স্বাভাবিক ভাবে যখন এরা বিপদে পরে বা কোন শিকারী প্রাণীর সামনে পরে তখন এরা কুকুরের মতো ঘেউ ঘেউ শব্দ করে বিপদের জানান দেয় বলে একে Barking deer বলে।
- মায়া হরিণ বন্যপ্রানী হলেও এরা অত্যন্ত নিরীহ ও সর্তক প্রাণী। এরা দিবাচারী বা নৈশচারী উভয় ধরনের স্বভাব প্রদর্শন করে।

বিএলআরআই আঞ্চলিক কেন্দ্রে মায়া হরিণ পালন এবং গবেষণা

মায়া হরিণ আমাদের দেশের একটি সম্ভাবনাময় জাতীয় সম্পদ যা দিন দিন বিলুপ্তির দিকে ধাবিত হচ্ছে। তাই বাংলাদেশের বর্তমান সরকার মায়া হরিণের সংরক্ষণ ও উন্নয়নের কথা গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করেছেন। তারই ফলশ্রুতিতে দেশের মায়া হরিণ সংরক্ষণের জন্য নাইক্ষ্যংছড়িতে অবস্থিত বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট এর আঞ্চলিক কেন্দ্রের গবেষণা খামারে 'Conservation and Improvement of Farm Animal Genetic Resource (FAnGR) at Hilly areas at Naikhongcahri' শিরোনামে একটি গবেষণা প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। এই গবেষনা প্রকল্পের আওতায় মায়া হরিণের বাহ্যিক এবং কৌলিক গুণাগুণ পর্যবেক্ষণ, উৎপাদন এবং পুনরোৎপাদন দক্ষতা নির্ণয়, প্রাকৃতিক প্রজননের পরিবেশ নিশ্চিতকরণ সহ আবদ্ধ অবস্থায় বিগত ২০১২ সাল থেকে মাত্র ০২ টি মায়া হরিণ নিয়ে গবেষণা কার্যক্রম শুরু করলেও বর্তমানে হরিণের সংখ্যা ১৮ টি। দ্রুত বর্ধনশীল এবং উৎপাদনক্ষম এ প্রাণীটির গবেষণালব্ধ ফলাফল নিম্নরুপঃ

মায়া হরিণের বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য

ক্র. নং	বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য	পুরুষ	স্ত্রী	গড়
১।	প্রাপ্ত বয়স্ক মায়া হরিণের ওজন	১৮-২৮ কেজি	১৫-২৫ কেজি	২২ কেজি
২।	বাচ্চার জন্ম ওজন	১.৮-২.৫ কেজি	১.৫-২.২ কেজি	২.১ কেজি
৩।	মায়া হরিণের উচ্চতা	১৮-২৮ ইঞ্চি	১৫-২৬ ইঞ্চি	২৪ ইঞ্চি
৪।	মায়া হরিণের দৈর্ঘ্য	৩৫-৪০ ইঞ্চি	৩২-৩৭ ইঞ্চি	৩৭ ইঞ্চি
৫।	পুরুষ ও স্ত্রী হরিণের পার্থক্য	শিং ও দন্ত আছে	শিং ও দন্ত নেই	-
৬।	সামনের পায়ের দৈর্ঘ্য	১৫-১৮ ইঞ্চি	১৪-১৬ ইঞ্চি	১৫ ইঞ্চি
৭।	পিছনের পায়ের দৈর্ঘ্য	১৬-২২ ইঞ্চি	১৪-১৮ ইঞ্চি	২০ ইঞ্চি
৮।	কানের দৈর্ঘ্য	৪.০-৪.৫ ইঞ্চি	৩.৫-৪.০ ইঞ্চি	৪.০ ইঞ্চি
৯।	শিং এর দৈর্ঘ্য	৫.৫-৬.০ ইঞ্চি (মাংশল শিং: ২.০-২.৫ ইঞ্চি, লোমশ শিং: ২.৫-৩.০ ইঞ্চি)		
১০।	গায়ের বর্ণ	গাড় বাদামী বা ধূসর বা হলুদাভ রঙের লোম দ্বারা আবৃত, কখনও কখনও গায়ে ক্রিম রঙের চিহ্ন থাকে, তবে তা নির্ভর করে ঋতু বৈচিত্র্যের উপর। শরীরের উপরিভাগ বাদামী বা সোনালী তামাটে রঙের হলেও পেটের নিচে সাদা রঙের পশম দ্বারা আবৃত থাকে। লেজের উপরিভাগ বাদামী বর্ণ কিন্তু নিচের ভাগ সাদা। মুখমন্ডল গাড় বাদামী বা কালচে বাদামী। কানে কম পরিমাণে পশম থাকায় কিছুটা কালচে রঙের হয়। পায়ের উপরি অংশ বাদামী হলেও নিচের অংশ কিছুটা কালচে বর্ণের।		

১১।	শিং এর প্রকৃতি	পুরুষ মায়া হরিণের শিং সাধারনত লোমশ বৃন্তিকার মতো, একটি বা দুটি শাখা বিশিষ্ট এবং এদের দুই ধরনের শিং লক্ষ্য করা যায়। এক ধরনের শিং বাহিরের দিকে বাঁকানো যাতে শিং হতে শিংয়ের দুরত্ব ৬-৮ ইঞ্চি অন্য ধরনের শিং ভিতরের দিকে বাঁকানো যাতে শিং হতে শিংয়ের দুরত্ব ৩-৪ ইঞ্চি।
১২।	দাঁত এর প্রকৃতি	পুরুষ মায়া হরিণের উপরের চোয়ালে বড় ও বাঁকানো ১.০-১.৫ ইঞ্চির একজোড়া ছেদন দন্ত (tusks or fangs) থাকে যা দূর হতে স্পষ্ট দেখা যায়। এই বড় শ্বাদন্ত এদের খাবার ধরতে ও চিবতে সাহায্য করে। এছাড়াও পুরুষ মায়া হরিণ তার লম্বা দাঁত দিয়ে গাছের ডাল চষে চষে তার নিজেস্ব এলাকার সীমানা চিহ্নিত করে রাখে। পুরুষ মায়া হরিণ প্রায়শই নিজের দখলকৃত এলাকার জন্য,পর্যাপ্ত খাবারের জন্য অথবা কখনও কখনও নিজের পছন্দের স্ত্রী মায়ার জন্য একে অন্যের সঙ্গে মারামারিতে জড়িয়ে পরে। আর এক্ষেত্রে তারা তাদের ছেদন দাঁত ব্যবহার করে থাকে।
১৩।	বিশেষ বৈশিষ্ট্য	মুখমন্ডলে একটি 'V' আকারের চিহ্ন থাকে যা শিং হতে চোখ পর্যন্ত বিস্তৃত। চোখের এক ইঞ্চি নিচে একটি কালো গ্রন্ড থাকে যাকে 'প্রিঅরবিটাল' গ্রন্থি বলে। এখান থেকে ঘ্রাণযুক্ত তরল নিঃসরণ হয়।

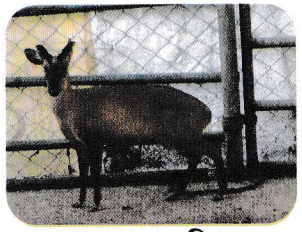

পুরুষ মায়া হরিণ

স্ত্রী মায়া হরিণ

পুরুষ ও স্ত্রী মায়া হরিণ

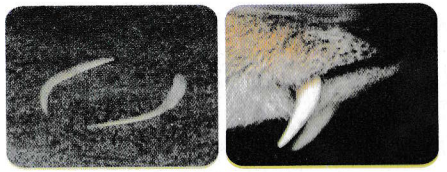

মায়া হরিণের দাঁত

মায়া হরিণের শিং

মায়া হরিণের পুনরোৎপাদন কর্মক্ষমতা

মায়া হরিণ কৌলিক বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে বহুগামী প্রাণী। স্ত্রী মায়া তার জন্মের প্রথম বছরের শেষে অথবা দ্বিতীয় বছরের শুরুতে প্রজননে চলে আসে। এরা বহুঋতুকালীন প্রাণী এবং এদের প্রতি ঋতুকাল ১৪-২১ দিন ধরে চলে, ঋতুচক্রের সময় ২ দিন।

ক্র. নং	পুনরোৎপাদন বৈশিষ্ট্য	বিবরণ
১	বাচ্চার জন্ম ওজন	স্ত্রী বাচ্চা: ১.৮০-১.৯৫ কেজি পুরুষ বাচ্চা: ১.৮৫-২.১০ কেজি
২	প্রাপ্ত বয়স্ক	০৬- ১০ মাসের মধ্যে যৌবন প্রাপ্ত হয়।
৩	প্রথম বাচ্চা জন্মের সময়কাল	সাধারনত ১২ থেকে ১৭ মাস
৪	গর্ভধারণ কাল	১৯০-২১০ দিন
৫	একবারে বাচ্চা প্রসব	০১ টি
৬	বাচ্চা দেয়ার পর পুনরায় গরম হওয়া/হিটে আসা	১৮-৩৫ দিন
৭	প্রজনন কাল	পুরুষ বা স্ত্রী মায়া হরিণের নির্দিষ্ট করে কোন প্রজনন কাল নেই। তবে প্রজনন মৌসুমে স্ত্রী মায়া তীক্ষ্ণ মিউ মিউ শব্দে ডাকে আর পুরুষ মায়া ডাকে ঘন্টা ধ্বনির শব্দে।
৮	আয়ুষ্কাল	গড় জীবন ধারণ কাল ১০-১২ বছর, তবে এরা ২০-৩০ বছর পর্যন্তও বাঁচতে পারে।

মায়া হরিণের খাদ্যভ্যাস

মায়া হরিণকে 'ব্রাউজার' (ছেড়ে খাবার স্বভাব) ও 'গ্রেজার' (চড়ে খাবার স্বভাব) দুই ধরণের খাদক হিসেবে বিবেচনা করা হয়। ঘাস মায়া হরিণের প্রধান খাবার তবে খাদ্যাভাস অনুযায়ী এটি একটি সর্বভূক শ্রেণীর প্রাণী। ঘাস ছাড়াও এরা ফল-মূল বিশেষ করে বনের জোপ-ঝাড়ের পরে থাকা ফল, শাক-সবজি যেমন কলমি শাক, বেগুন, লাউ, কুমড়া ও কলা গাছের ভিতরের নরম অংশ, চিরহরিত লতা, কন্টকযুক্ত ঝোঁপঝাড়, কম বর্ধণশীল গাছের পাতা, বাকল ও ডাল, গাছের অঙ্কুর ও বীজ, পাখির ডিম কাকরা বা চিংড়ি এমনকি এরা ছোট ছোট প্রাণীও খেয়ে জীবনধারণ করে থাকে। ঘাস খাবার জন্য এরা বনের কিনারা বা খোলা জায়গায় আসে। যে সকল বনের মাঝখানে ছোট খোলা পরিত্যক্ত জায়গা আছে সেই সকল খোলা জায়গাতেই মায়া হরিণকে বেশি বিচরণ করতে দেখা যায়। কেওড়া পাতা এদের খুব পছন্দ। আমাদের দেশের চা-বাগান গুলোতে এদের বেশি বিচরণ করতে দেখা যায়, কারণ এরা চা-গাছের নিচে পরে থাকা চা-ফল খেতে পছন্দ করে। শীতে এরা খুব কম খায় এবং ১ থেকে ২ ঘন্টা খেলেই এদের পেট ভরে যায়। গবেষণায় দেখা গেছে, একটি পূর্ণ বয়স্ক মায়া হরিণ প্রতিদিন গড়ে প্রায় ২ কেজি সবজি যেমন: মিষ্টি কুমড়া, লাউ, লাল শাক, কাউপি, কলা গাছের ভিতরের নরম অংশ, ১ কেজি দানাদার খাদ্য মিশ্রন খেয়ে থাকে এবং প্রতিদিন প্রায় ২ লিটার পানি পান করে থাকে।

মায়া হরিণের রোগসমূহ ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা

মায়া হরিণের রোগবালাই তেমন নেই বললেই চলে। গবেষণায় দেখা গেছে, মায়া হরিণের শরীরের চামড়ায় মারামারির কারণে কিছু ক্ষত দেখা যায়। এছাড়া, হরিণের প্রসবকালীন সময় ডেসটোকিয়াও লক্ষ্য করা গেছে।

মায়া হরিণের হুমকি ও ক্রমাগত বিলুপ্তি

বাংলাদেশের মোটামুটি সবগুলো বনাঞ্চলের আশে-পাশে লোকালয়ের আবাসস্থল, তাই এ সকল বনে বিচরণ করা মায়া হরিণ বনের বাইরে খাবারের সন্ধানে লোকালয়ে চলে আসলে আর বনে ফিরে যাবার সম্ভাবনা থাকে না। বেশিরভাগ সময় জনবসতির উৎসুক মানুষের হাতে আবার কখনও শিকারীদের তৈরী ফাঁদে ধরা পরে মায়াবী এই হরিণ। বাংলাদেশে অহরহ চলছে হরিণ শিকারের মতো জঘন্য অপরাধ, কিছুতেই দমন করা যাচ্ছে না চোরা শিকারীদের। সৌখিন শিকারীসহ সংঘবদ্ধ একটি চক্র দীর্ঘ দিন ধরে মায়াবী এই বন্য প্রাণীটিকে হত্যার কাজে লিপ্ত রয়েছে। যথাযথ আইনি পদক্ষেপের অভাবে স্থানীয় পর্যায়ের এই চোরা শিকারীরা হরিণ শিকারে দ্বিগুন উৎসাহিত হচ্ছে। মানুষের অবৈধ কর্মকান্ডের ফলে অরণ্য যেমন হারাচ্ছে তার স্বাভাবিক রুপ বৈচিত্র্য তেমনি বিলীন হয়ে যাচ্ছে বনের প্রাকৃতিক পরিবেশ। আর তারই ফলশ্রুতিতে বন্য প্রাণী হয়ে পড়েছে গৃহহীন, শ্রীহীন। এভাবে হরিণ তার প্রাকৃতিক বাসস্থান হারিয়ে চলে আসছে জনবসতি এলাকায় আর পড়ছে অবৈধ হরিণ শিকারীদের হাতে, যার ফলে মায়া হরিণ আজ এই দেশে বিপন্ন প্রাণীর তালিকায়।'The IUCN Red List of threatened Species-2016' এর প্রতিবেদন অনুযায়ী বাংলাদেশের মায়া হরিণ 'নূন্যতম বিপদগ্রস্থ' (Least Concern) এবং মায়া হরিণের বর্তমান হুমকির মধ্যে সবচেয়ে প্রধান হুমকি হল 'চোরাগুপ্তা শিকার' । মায়া জাতের হরিণের নতুন পরিবেশে অভিযোজন ক্ষমতা অত্যন্ত বেশি থাকা সত্ত্বেও দিন দিন প্রাকৃতিক পরিবেশ ও নিজস্ব বাসস্থান হারানোর ফলে এর টিকে থাকা এক বড় হুমকি। বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রামে দক্ষিন-পূর্বাঞ্চলে ২০১০-২০১১ সালের IUCN এর ক্যামেরার ফাঁদে আটকানো ছবি দিয়ে চালানো জরিপে মায়া হরিণের সনাক্ত করা দখলকৃত সীমানা চিহ্নিত করা হয়। এতে মায়া হরিণের মূল আবাসস্থল ও তার বর্তমান আবাসস্থলের বেশ পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। মায়া হরিণ তার নিজস্ব পরিবেশের সীমারেখার মধ্যে বৈধ আর অবৈধ উপায়ে শিকার হয়ে থাকে মূলতঃ তার মাংস আর চামড়ার জন্যে। কারণ বাংলাদেশসহ দক্ষিন ও দক্ষিন-পূর্ব এশিয়ায় মায়া হরিণের মাংস অধিক পছন্দনীয় এবং দামি হওয়ায় অর্থলোভী হিংস্র শিকারীদের দূর্বার আর্কষন এখন অসহায় এই মায়াবী হরিণকুলের উপর।

মায়া হরিণ সংরক্ষণ ও গবেষণা

IUCN তার 'Conservation Actions' পাদটীকায় মায়া হরিণকে তার নিজস্ব পরিসীমা জুড়ে থাকা অবস্থানে সংরক্ষণ করা এবং এ সমস্ত অংশে যে কোন পর্যায়ে আইনের মাধ্যমে অবাধ শিকার নিষিদ্ধ করার কথা উল্লেখ রয়েছে। বাংলাদেশের বণ্যপ্রাণী সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত প্রচলিত আইন রহিতপূর্বক দেশের

জীববৈচিত্র্য, বন ও বণ্যপ্রানী সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা বিধানকল্পে প্রণীত আইন "বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন, ২০১২" এর তৃতীয় অধ্যায়ের 'বন্যপ্রানী ও উদ্ভিদ সংক্রান্ত নিষেধাজ্ঞা' উপ-শিরোনামের অনুচ্ছেদ ৬(১) এ লাইসেন্স বা পারমিট গ্রহণ ব্যতীত যে কোন ব্যক্তিকে বন্যপ্রাণী শিকার বা ধ্বংস বা সংগ্রহ করার নিষেধ আরোপ করা হয়েছে এবং অনুচ্ছেদ ৬(২) এ সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা কোন নির্দিষ্ট বা সকল বন্যপ্রাণী কোন নির্দিষ্ট বন বা এলাকা বা সমগ্র দেশের নির্দিষ্ট সময়ের জন্য শিকার নিষিদ্ধ করতে পারবে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়াও উক্ত আইনের চর্তুথ অধ্যায়ের 'সাফারী পার্ক, ইকোপার্ক, উদ্ভিদ উদ্যান এবং বন্যপ্রাণী প্রজনন কেন্দ্র ঘোষনা' উপ-শিরোনামের অনুচ্ছেদ ১৯ অনুযায়ী সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বন্যপ্রাণীর স্বীয় আবাসস্থলে (in-situ) বা আবাসস্থলের বাইরে অন্যত্র (ex-situ) সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে অথবা গবেষণা, জনসাধারণের চিত্তবিনোদন বা শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে যে কোন সরকারী বনভূমিকে, সাফারী পার্ক, ইকোপার্ক, উদ্ভিদ উদ্যান বা ক্ষেত্রমতে, বন্যপ্রানী প্রজনন কেন্দ্র হিসেবে ঘোষণা করতে পারবেন। "বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন, ২০১২" এর দশম অধ্যায়ের 'বৈজ্ঞানিক গবেষণা' উপ-শিরোনামের ৪৮ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী ব্যক্তিগত পর্যায়ে বা সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানিক পর্যায়ে যে কেউ কোন বন্যপ্রাণী বা বন্যপ্রাণীর আবাস্থল বিষয়ে গবেষণা করতে পারবেন,তবে এক্ষেত্রে উক্ত অঞ্চলের প্রধান ওর্য়াডেন বা তৎকর্তৃক ক্ষমতা প্রাপ্ত কোন কর্মকর্তার নিকট হতে অনুমতি গ্রহণ করার কথা বলা হয়েছে। বাংলাদেশ বন্যপ্রানী আইন (সংরক্ষণ, সংশোধন), ১৯৭৪ এর আওতায় হরিণ পোষা সংক্রান্ত নীতিমালা "হরিণ লালন-পালন নীতিমালা-২০১০" অনুমোদন করেছে সরকার। নীতিমালা অনুযায়ী শর্তসাপেক্ষে যে কেউই হরিণ ঘরে বা খামারে লালন পালনের সুযোগ পাবেন তবে তা কেবল চিত্র হরিণের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য অন্য কোন জাতের হরিণের ক্ষেত্রে নয়। তবে এ জন্য পালনকারীকে হরিণের বসবাস উপযোগী পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে। কেবলমাত্র লাইসেন্স ধারীরাই লোকালয়ে বা বসতবাড়িতে হরিণ পালনের সুযোগ পাবেন। লালন পালনের জন্য উপযুক্ত শর্ত পুরণ করে আগ্রহী ব্যক্তিকে 'ফি'র বিনিময়ে বন বিভাগ থেকে লাইসেন্স নিতে হবে। ব্যক্তি পর্যায়ে সর্বোচ্ছ ১০ টি হরিণ পোষা যাবে এর বেশি হলে খামার হিসেবে অনুমোদন নিতে হবে। বন বিভাগ ও চিড়িয়াখানা কর্তৃপক্ষ নিজস্ব নিয়ম অনুযায়ী হরিণ বিক্রি করতে পারবে। খামারের হরিণ পালন সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট বন সংরক্ষক এবং ব্যক্তিগত হরিণের ক্ষেত্রে বিভাগীয় বন কর্মকর্তার কাছে বার্ষিক প্রতিবেদন দিতে হবে। হরিণ পরিণত হলে তার মাংস খাওয়া যাবে তবে বাচ্চা প্রসব করলে বা মারা গেলে ঘটনা ঘটার ১৫ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বন বিভাগের কাছে তা জানাতে হবে। হরিণের মাংস বা কোনো অঙ্গ স্থানান্তর করতে হলে সংশ্লিষ্ট বিভাগ থেকে স্থানান্তর অনুমোদন নিতে হবে এবং কাউকে হরিণ দান করতে হলেও বন বিভাগকে অবহিত করতে হবে।

অর্থনৈতিক ও সামাজিক ভাবে হরিণ পালন

প্রাচীনকালে মানুষ বন্য পশু-পাখি শিকার করত নিতান্তই প্রয়োজনের তাগিদে তাদের খুধা নিবারণের জন্য, শখ বা বিনোদনের জন্য নয়। একসাথে কয়েকটি পশু-পাখি ধরতে পারলে, প্রয়োজন মতো জবাই করে বাকিগুলোকে ভবিষ্যতের জন্য গৃহে আবদ্ধ করে রাখতো। সেই ধ্যান-ধারণা থেকেই হয়তো বন্য প্রাণী নিজ গৃহে লালন-পালনের সূত্রপাত ঘটে। গৃহে আবদ্ধ বন্য প্রাণীর মধ্যে কিছু প্রজাতির প্রাণী মানুষের বশ্যতা স্বীকার করে নেয় এবং মানুষের কাছে থেকেই বংশবিস্তার করতে থাকে। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনের সুরা ইয়াছিনে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেন, "আমি চতুষ্পদ জন্তুগুলোকে ওদের বশীভূত করে দিয়েছি; কতক তাদের খাদ্য আর কতক তাদের বাহন, তবুও কি তারা কৃতজ্ঞ হবে না"। তাই গরু, মহিষ, ছাগল ও ভেড়া ইত্যাদি মাংসের জন্য আর ঘোড়া, গাধা, খচ্ছর ও হাতি ইত্যাদি বোঝা বহনের কাজে লাগানোর জন্য জঙ্গল থেকে ধরে এনে গৃহপালিত করা হয়েছে। গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া ও হাঁস-মুরগীর মাংসের তুলনায় হরিণের মাংস অবশ্য অনেক ব্যয়বহুল। সম্ভবতঃ সেটা অনেকটা দুঃষ্পাপ্যতার কারণে অথবা দুঃষ্পাপ্য মাংসের প্রতি সবার আগ্রহের কারণেও হতে পারে, তাই হরিণ পালন বেশ লাভজনকই বলা যায়। আর সেই সুযোগটা কাজে লাগিয়ে বসতভিটায় হরিণ পালনের মাধ্যমে আয় করার ধ্যান-ধারণা তাই হয়তো অবাস্তব কিছু হবে না। হরিণ পালন আমাদের সমাজে আভিজাত্যের প্রতীক হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে। যে বাড়িতে হরিণ পালন করা হয় সে বাড়ির মালিকের পরিচিতি সর্বত্র ছড়িয়ে যায়। আর এই পরিচিতিতে তিনি কিছুটা আনন্দিত ও গৌরবান্বিত হন। সেই সাথে আগন্তুক বা জনসাধারণেরা বিনোদনের খোরাক পান। বাংলাদেশের অনেক অঞ্চলে বাড়িতে হরিণের শিং বা কখনও কখনও শিংসহ মাথা আবার পশমযুক্ত হরিণের চামড়া যা ফ্যানসি স্কিন হিসেবে ঘরের দেয়ালে সুসজ্জিত থাকতে দেখা যায়, যা কিনা সম্ভ্রান্ত পরিবারের প্রতীক হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এছাড়াও পশমযুক্ত হরিণের চামড়া বা চামড়াজাত বিভিন্ন প্রকারের অতি মূল্যবান পণ্য তৈরিতে হরিণের চামড়া ব্যবহার করা হয়। দেশে-বিদেশে ঘরের পরিবেশ সুশোভিত করতে হরিণের ফ্যান্সি চামড়া অতি কাঙ্খিত একটি উপকরণ।

বসতবাড়ি ও খামারে হরিণ পালন সম্ভাবনা

বাংলাদেশ একটি কৃষিপ্রধান দেশ হওয়ায় এদেশের মানুষ বহুকাল আগ থেকেই গরু, মহিষ, ভেড়া, ছাগল এবং হাসঁ-মুরগী লালন পালন করে আসছে। এদেশের গ্রাম আর শহরের মানুষ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রকারন্তরে প্রাণিসম্পদের উপর নির্ভরশীল। কারণ, এটি বর্তমান সময়ে কর্মসংস্থান সৃষ্টি, নারীর ক্ষমতায়ন এবং গরীব মানুয়ের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করে আসছে। প্রাণিসম্পদ লালন-পালনের বিষয়ে তাদের এই বাস্তব অভিজ্ঞতা ও চিন্তা-ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে তৃণভোজী আলোচ্য এই প্রাণীটিকে লালন-পালন ও পরিচর্যার জন্য গনসচেতনতা বাড়ানোর পাশাপাশি মানুষকে উদ্বুদ্ধকরণ বেশ গুরুত্বপুর্ণ। অন্যান্য প্রাণিসম্পদ যেমন: ছাগল-ভেড়া, গরু-মহিষ এবং মোরগ-মুরগী পালনের ন্যায় হরিণ পালন একটি সহজসাধ্য ব্যাপার। এদের খাদ্য ও বাসস্থান ব্যবস্থাপনা সহ আমাদের দেশের আবহাওয়া হরিণ পালনের জন্য যথেষ্ট অনুকূল এবং লালন-পালন ও পরিচর্যার ক্ষেত্রে তেমন কোন জটিলতা না থাকায় এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ পশু বিজ্ঞানী, পশু-চিকিৎসক ও পশু-পুষ্টিবিদগণ সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করতে পারবেন। এমতাবস্থায়, বসতবাড়ির আঙ্গিনায় বা খামার করে হরিণ পালনকে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি উন্নয়নের কাঠামোতে অর্ন্তভূক্ত করা যায় কিনা সেটা সম্ভবত: ভাববার সময় এসেছে। সরকার ও বেসরকারী বিভিন্ন সংস্থা বা সরকারী বিভিন্ন গবেষণা ইনস্টিটিউট এ বিষয়ে যথাযথ গুরুত্ব আরোপ করলে হয়তো একটা দিক নির্দেশনা পাওয়া যেতে পারে।

উপসংহার

বন্যপ্রাণী মায়া হরিণ আমাদের একটি জাতীয় প্রাণিসম্পদ, যেটি বর্তমানে বনের প্রাকৃতিক পরিবেশ বিপর্যয় আর স্থানীয় শিকারীদের শিকার হয়ে ক্রমাগত বিলুপ্তির দিকে ধাবিত হচ্ছে। তাই দ্রুত বর্ধনশীল এবং উৎপাদনক্ষম এই মায়াবি হরিণ কূলকে নিজ প্রাকৃতিক পরিবেশে সংরক্ষণের পাশাপাশি গবেষণার মাধ্যমে এর উন্নয়ন এবং কৃত্রিমভাবে প্রজননের মাধ্যমে বংশবিস্তার করে এর সংখ্যা বৃদ্ধি করা যেতে পারে। তবে, এক্ষেত্রে সরকারী এবং বেসরকারীভাবে উদ্যোগ নেয়ার পাশাপাশি হরিণ সংরক্ষণ ও উন্নয়নে প্রয়োজন গণসচেতনতা ।